কচ্ছপ

শুজা রশীদ

পুরানো দিনের বন্ধুরা একসাথে হলে আলাপের মোড় যে কখন কিভাবে ঘুরে কোথায় গিয়ে স্থির হবে বলা প্রায় অসম্ভব। তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পেলাম লন্ডন, ওন্টারিওতে এসোসিয়েট প্রফেসর বন্ধু তপুর বাসায় বেড়াতে গিয়ে। ইউনিভার্সিটি জীবনের বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সপরিবারে মিলেছি। বন্ধু এবং বন্ধু পত্নী তাদের আতিথেয়তার যেন কোন কমতি না হয় সেটা প্রমাণ করবার জন্যই যেন টেবিল নানা সুস্বাদু খাবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। পোলাও, কালিয়া, কোফতা থেকে শুরু করে গরুর ভুনা, মুরগীর কোর্মা, ডিমের কারি, রাজ্যের ভর্তা...। খেতে খেতে স্মৃতিচারণের শুরু হল যখন বন্ধু ফেরদৌস ঘটা করে নিজ প্লেটে দুটি ডিম তুলে নিয়ে ঘোষনা দিল, "ডিমের তরকারীর উপর আর কিছু হয় না।"

ফেরদৌসের ডিম প্রীতির খবর আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার চেয়েও কয়েক মাত্রা উপরে যে আরেকজন ছিল সে খবর আমাদের জানা ছিল না। তপু শহীদুল্লাহ হলে থাকত। সে কথাচ্ছলে বলল, "তুই তো আমাকে ডিম বিটুর কথা মনে করিয়ে দিলি রে। বিটুকে মনে আছে তো তোদের?"

বিটূকে মনে না থাকার কোন কারণ নেই। ঠ্যাঙা, হাড্ডিসার ছিল, কিন্তু মুখের হাসি কখনও মলিন হত না। মেয়ে দেখলেই প্রেমে পড়ত এবং তা প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা করত না। ফলাফল শূন্য হলেও লাভ লোকসানের হিসাব করবার তার সময় ছিল না। তার ভাষ্য অনুযায়ী 'কত যাবে কত আসবে!'। যদিও কাউকে আসতে কখনও আমরা কেউ দেখিনি, সবাইকে শুধু যেতেই দেখেছি।

"ডিম বিটু!" আমি অবাক হয়ে বলি। "প্রেমিক বিটু ডিম বিটু হল কবে?"

তপু মুচকি হেসে বলল, "তুই তো তাহলে বিটূর কিছুই জানিস না। ডিম বিটু হবার ইতিহাসটা শোন তাহলে।"

উপস্থিত বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তপুই হলে থাকত। আমরা বাকীরা ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দা ছিলাম। বাসা থেকে ক্লাশ করতাম। যদিও প্রায়ই হলে গিয়ে আড্ডা মারতাম।

শহীদুল্লাহ হলের লাগোয়া বিশাল দীঘিতে একদিন বিটুর সাথে গোছল করতে গেছে আমাদের আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বহুল পরিচিত নাম প্রফেসর জর্জিস। সে তুখোড় সাঁতারু। খেলাচ্ছলে বিটুর সাথে বেট ধরল, সে যদি দু'বার দিঘীর এপার ওপার করতে পারে তাহলে তাকে দশটা ডিম খাওয়াবে। বিটু চাপাচাপি করে ডিম দশটা থেকে চৌদ্দটাতে নিয়ে এলো। বিটু দক্ষ সাতারু ছিল। সে বাজীতে জিতে গেল। জর্জিস বলল, তাকে ডিম তখুনিই খেতে হবে। সে বিটূকে নিয়ে ক্যাফেটারিয়াতে গেল। দশটা-বারোটা ডিম খাবার পর বিটুর চোখ উলটে গিয়ে মূর্ছা যাবার দশা। তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হল। সেই থেকে বিটুর নাম হয়ে গেল ডিম বিটু।

তপু বলল, "ডিম বিটুর আরোও অনেক কেচ্ছা আছে। হুমায়ুন স্যারের সাথে ওর কি হয়েছিল সেটা বলি..."

জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ স্যার তখন শহীদুল্লাহ হলের রেসিডেন্ট টিচার। স্যার চুপচাপ মানুষ ছিলেন কিন্তু প্রয়োজনে শক্ত হতে পারতেন। হলের দায়িত্ব পাবার পর রাত দশটার পর হলের গেটে তিনি তালা লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। দেরী করে ফিরলে দারোয়ানকে বলে গেট খুলিয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হয়। ডিম বিটু এক রাতে আরেক বন্ধুর সাথে বেশ দেরী করে ফিরেছে। স্যার হলের গেট সংলগ্ন দোতলা বাসায় পরিবার নিয়ে থাকেন। তার স্ত্রী তখন গুলতেকিন। তিনটি মেয়ে। সবাই তখনও জেগে। বিটু গেটের সামনে গিয়ে হেঁড়ে গলায় গান ধরল 'চুপ চুপ গুলতেকিন, চুপ, কথা বলো না; তুমি আমি এইখানে হুমায়ুন জানে না'। আযম খানের বিখ্যাত গানের প্যারোডি।

স্যার দারোয়ানকে পাঠিয়ে বিটুকে ডেকে পাঠালেন। নীচু গলায় বিটুকে শাসালেন, "আমি হলাম কচ্ছপের মত। একবার কামড়ে ধরলে সহজে ছাড়ি না। ভেবে চিন্তে কাজ কর।"

বিটু তারপর আর কখনও তার সামনে আপত্তিকর গান গেয়েছে বলে শোনা যায়নি। স্যারের স্ত্রী গুলতেকিন খুব পার্সোনালিটি নিয়ে চলতেন এবং সকলে তাকে সমীহ করত। এতগুলি ছেলেদের মাঝে স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করাটা যে কি পরিমান কঠিন হতে পারে সেটা সহজেই ধারণা করা যায়।

হুমায়ুন স্যারকে নিয়ে আরোও কিছুক্ষণ আলাপ চলে।

এক চাঁদনী রাতে স্যার তার তিন মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন দীঘিতে গোছল করতে। দৃশ্যটা চিন্তা করে ভালো লাগে। ঐরকম একটা পরিবেশে নিজের তিন মেয়েকে একটা স্বাভাবিক জীবন উপহার দেবার চেষ্টা করছিলেন তিনি, তার সেই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতেই হয়।

আরেক দিনের ঘটনা।

হলে এক চোর ধরা পড়েছে। ছেলেরা খুব মারধোর করছে। স্যার গিয়ে বললেন, "সামান্য চোরকে মেরে কি লাভ? মরে টরে গেলে তোমরাই বিপদে পড়বে।" তিনি চোরটাকে উল্টো কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করলেন।

ছাত্ররা হয়ত একটু মজা করবার জন্য তার বিরুদ্ধে ছদ্ম কোপে হল প্রাঙ্গণে মিছিল শুরু করলঃ 'হুমায়ুনের চামড়া খুলে নেব আমরা'।

একটু পরে স্যারের তিন মেয়ে বাসার জানালা থেকে চীৎকার করে সমস্বরে উলটা শ্লোগান দিতে শুরু করলঃ 'হুমায়ুনের চামড়া, লাগিয়ে দেব আমরা'।

এই পর্যায়ে আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম। এই ঘটনার কথা আমরা আগে কখনও শুনিনি।

তপু আরেকটা খুব হৃদয়গ্রাহী ঘটনার কথা বলল। হুমায়ুন স্যারের প্রথম পুত্র সন্তান জন্মের পর পরই মারা যায়। এই খবর পেয়ে হলের ছেলেরা অনেকেই খুব কষ্ট পায়। পরিবেশ বিষাদক্ষিন্ন হয়ে থাকে। সেই সময় স্যারের মেয়েরা একদিন বাসার জানালা খুলে হলের প্রাঙ্গণের দিকে ফিরে সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে সবার মন ভালো করবার চেষ্টা করেছিল।

হলের জীবনে ছেলেমেয়েরা দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসে তাদের পরিবার পরিজন ফেলে। তাদের জীবনে স্যার এবং তার পরিবার তাদের প্রয়াস দিয়ে কিছুটা হলেও যে আনন্দের ছোঁয়া দিয়েছিলেন, বন্ধু তপুর কণ্ঠেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই।

হুমায়ুন স্যারের মৃত্যু বার্ষিকী জুলাই ১৯। তার মৃত্যুর পর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে। শুনেছি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে যখন যুঝছিলেন তখন মন খারাপ করে বলেছিলেন, "একটা কচ্ছপ বাঁচে দুই শ বছর, আর মানুষ বাঁচে মাত্র ষাট সত্তর বছর!" তিনি ক্যান্সারে যখন মারা যান তখন তার বয়েস ছিল মাত্র ৬৩। তার নিশ্চয় আরোও অনেক কিছু করার ছিল, দেবার ছিল, অকাল মৃত্যুতে তার সবই হারিয়ে গেল অজানায়। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার মনে অন্তত কোন সন্দেহ নেই। তার হৃদয় আকুল করা লেখা, নাটক, ছায়াছবি দিয়ে তিনি যেভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের মনে দৃঢ় স্থান করে নিয়েছেন তাতে তার অবস্থান সেখানে কচ্ছপের আয়ুর চেয়েও আরোও অনেক সুদীর্ঘ হবে।